

[redacted] ‘[redacted]’, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Posted on June 23, 2026 by Sushovan Dhar

[redacted]

চেয়ে নিজেদের শর্তে সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে যাওয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। আপাত-নিরীহ দৃশ্য। স্বেচ্ছায় সম্পন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ এক বহিষ্কার। দৃশ্যের ভিতরে বিভীষিকার মতো দপদপ করছে রাষ্ট্র-ঘোষিত নির্মম অভিপ্রায় – অসহায় মানুষ যা আগেভাগেই মেনে নিয়েছেন অমোঘ নির্দেশ মনে করে।

ভারতে ‘অনুপ্রবেশবিরোধী অভিযান’ বাস্তবে ঠিক কেমন, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সরকার গঠনের তিন সপ্তাহ পর তার চিত্রটি দেখা গেল। ২০২৬ সালের ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয় দ্রুত গতিতে – একের পর এক জেলায় হোল্ডিং সেন্টার গড়ে তোলা, প্রশাসনকে পরিচয় যাচাই ও আটক করার নির্দেশ, রেলস্টেশন ও সীমান্ত পারাপারের পথগুলিতে নজরদারি বাড়াতে নিরাপত্তা বাহিনীকে আদেশনামা, খুব দ্রুত ঘটে যেতে লাগল সবকিছু। নির্বাচনের সময় অভিবাসন ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রচার চালিয়েছিল বিজেপি, বাংলার ভোটারদের তা ছিল বিজেপির অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। অন্য প্রতিশ্রুতিগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দেবার বিষয়টি ভঙ্গিমামাত্র হলেও ‘অভিবাসন’ ইস্যু কয়েক দিনের মধ্যেই প্রশাসনিক বাস্তবে পরিণত হল।

একে শুধুমাত্র একটি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ঘটনা হিসেবে দেখলে বড় ভুল হবে, এমনকি কোনও একক রাজ্য সরকারের ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রয়োগ বলে ভাবলেও। বাংলায় ‘পুশব্যাক’-এর ঘটনাগুলি একসঙ্গে চারটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে। চারটি দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমত, সাম্প্রতিক ‘পুশব্যক’ একটি পরিকল্পিত বহিষ্কার-বন্দোবস্তের অন্তিম এবং সর্বাধিক স্পষ্ট জানানদারি। ভারত গত প্রায় দুই দশক ধরে যা নির্মাণ করেছে এবং ক্রমশ জোরদার করে চলেছে। দ্বিতীয়ত, এগুলি এমন এক আদর্শগত প্রকল্পের ফলিত রূপ, যার শিকড় প্রায় এক শতাব্দী পুরনো। তৃতীয়ত, ভারতের নিজস্ব সংবিধান এবং দেশটি যে আন্তর্জাতিক সনদগুলিতে স্বাক্ষর করেছে, তার মানদণ্ডে বিচার করলে এই পদক্ষেপগুলি চরম বেআইনি। এবং চতুর্থত, এগুলি সেই ‘বাংলাদেশি’ আখ্যানের পরিণতি। শুধু বিজেপি নয়, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার বিস্তৃত পরিসর জুড়েই যার

নির্মাণ চলেছে – যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে বাঙালি পরিচয়ের প্রতি অবজ্ঞা এবং দরিদ্র মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্য।

এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে দেখলে হাকিমপুরের সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমান মানুষের দৃশ্যটি বোধগম্য হয়ে ওঠে – স্পষ্ট হয়ে যায় তার সঙ্গে জুড়ে থাকা এমন এক বহিষ্কারকেন্দ্রিক রাজনীতির যোগসূত্র, যা বর্তমানে ওয়াশিংটন থেকে বার্লিন – ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

মানুষ ধরার নিখুঁত ফাঁদ

এই অভিযানে বাস্তবে যাঁরা ধরা পড়ছেন, তাঁদের দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। তাঁদের অভিজ্ঞতাই সরকারি ভাষার কেরামতির আড়ালে থাকা বাস্তবতার লেখচিত্র । রাষ্ট্র ‘অনুপ্রবেশকারী’ এবং ‘অবৈধ অভিবাসী’-ইত্যাদি শব্দবন্ধ তৈরি করেছে – এইসব শ্রেণিবিভাগ স্পষ্ট এক বিভাজনরেখার ধারণাকে হাজির করে যার একদিকে রয়েছেন নাগরিক, যাঁর এই দেশে থাকার অধিকার আছে, আর অন্যদিকে সেই বিদেশি, যাঁর নেই। কিন্তু বাস্তব সেই সরল বিভাজনরেখা অনুসরণ করে না।

উপরের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। ২০২৫ সাল জুড়ে ওড়িশা থেকে শত শত, গুরুগ্রাম থেকে পালাতে বাধ্য হওয়া কয়েক ডজন এবং রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র থেকে আরও বহু বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিককে শুধুমাত্র তাঁদের কথ্য ভাষা বা উপভাষা ‘বিদেশি’ বলে মনে হওয়ায় আটক করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। তাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও পুলিশ সেগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

শেষের তথ্যটিই আসলে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। যখন ভাষা কোনও ব্যক্তির ‘বিদেশি’ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, তখন ‘অনুপ্রবেশকারী’ শব্দটি আর কোনও আইনি অবস্থানকে নির্দেশ করে না; তা হয়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার কৌশল। প্রতিটি দরিদ্র, বাংলা

ভাষাভাষী, মুসলিম শ্রমিক সন্দেহভাজনে পরিণত হন, যাঁকে যে কোনও সময়, প্রায়শই নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও, প্রমাণ করতে হয় যে তিনি এই দেশেরই মানুষ।

এই কাঠামো এমনভাবেই নির্মিত যে তাতে ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ এখানে প্রমাণের দায় সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে বিদেশি নাগরিকরা প্রায় কোনও সাংবিধানিক সুরক্ষাই ভোগ করবেন না। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইঙ্গিত দিয়েছে যে যাঁদের আটক করা হবে, তাঁদের দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার আগে আদালতে পেশ করা বাধ্যতামূলক নয়। ফলত কেন তাঁদের সীমান্ত পার করে পাঠানো হবে না, তা প্রমাণ করার দায় এসে পড়ছে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর। একজন নিরক্ষর দিনমজুরের পক্ষে এই মানদণ্ড পূরণ করা কার্যত অসম্ভব। আর এইরকম মানুষের সংখ্যাটা বাড়িয়ে সস্তা লোকপ্রিয়তা কুড়োতে আগ্রহী কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে এই অবস্থাটা যে বিপুল সুবিধাজনক তা বলা বাহুল্য ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিভাগের ডিরেক্টর ইলেইন পিয়ারসন এই ধরনের বহিষ্কারকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সতর্কবার্তা, কোনও আটক ব্যক্তির কাছে নথিপত্র না থাকলেও তাঁর আইনি প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভুলবশত কোনও নাগরিককে দেশছাড়া হতে না হয়।

এই ফাঁদে যখন তথাকথিত নাগরিকও পড়ে যান, তখন তাকে ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলে মনে করলে চরম ভুল হবে। রাষ্ট্রীয় নকশায় তৈরি ফাঁদের লক্ষ্যই হল মানুষকে ঠিক এভাবেই ধরে ফেলা।

এটি নতুন কিছু নয়, আর সেটাই আসল বিষয়

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখে একে একটি আকস্মিক বাঁকবদল হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রলোভন তৈরি হতে পারে – রাজ্যটি দীর্ঘদিন বিজেপির উত্থান প্রতিরোধ করে এসেছিল, অবশেষে দলটি ক্ষমতায় এসেছে, ফলে এখন আর কোনও

রাখঢাক না করে সে অভিযান শুরু করেছে। কিন্তু ২০২৬ সালের মে মাসে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার যে অভিযান শুরু করেছে, তা নতুন কিছু নয়। এটি একটি জাতীয় পরিকল্পনার রাজ্যস্তরের প্রয়োগ মাত্র, ২০১৪ সালে বিজেপি দিল্লির ক্ষমতা দখল করার পর থেকে যা ক্রমশ বিস্তৃত ও দ্রুততর হয়েছে – এবং যার ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল আরও অনেক আগে থেকে।

অসম এই প্রকল্পের প্রথম পরীক্ষাগার। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে হালনাগাদ হয়ে ২০১৯ সালের আগস্টে চূড়ান্ত হওয়া ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স (এনআরসি) থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে। এতে তাঁরা এক গভীর এবং অকল্পনীয় অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন – একদিকে ‘ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল’, আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা হলেও খামখেয়ালিপনা ও স্বেচ্ছাচারী যুক্তি প্রয়োগের জন্য কুখ্যাত। অন্যদিকে ‘ডি-ভোটার’ বা ‘সন্দেহভাজন ভোটার’-এর পুরনো শ্রেণিবিন্যাস, যেখানে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তির ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে ওঠে এক বিস্তৃত আটক কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক। যার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হল গোয়ালপাড়ার মাতিয়ায় অবস্থিত বিশাল শিবির। সেখানে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা যেতে পারে, যতক্ষণ না রাষ্ট্র ঠিক করছে তাঁদের কোথায় পাঠানো হবে।

এই নিষ্ঠুরতা এনারসি প্রক্রিয়ার অনিচ্ছাকৃত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল না; বরং এইটিই ছিল এই প্রকল্পের সাফল্য প্রমাণের পথ।

২০১৪ সালের পর, এবং বিশেষ করে ২০১৯ সালে বিজেপির দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর ক্রমবর্ধমান গতিতে, এই মডেলটি জাতীয় স্তরে বিস্তৃত হতে থাকে। ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং সারা দেশে এনআরসি চালুর সম্ভাবনা নাগরিকত্বকেই এমন এক প্রশ্নে পরিণত করে, যার উত্তর দিতে যে কোনও দরিদ্র

ভারতীয়কে হঠাৎই বাধ্য করা হতে পারে।

‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে ধরপাকড়ের ঘটনা দিল্লি, গুজরাতের আহমেদাবাদ, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার রীতিমতো রাজনৈতিক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম শ্রমিকরা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অভিযানগুলি রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিচালিত হয়েছে।

২০২৫ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি সার্কুলার এই ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়। ওই নির্দেশিকায় রাজ্যগুলিকে আন্তঃরাজ্য স্তরে সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওড়িশা থেকে হরিয়ানা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের শুধুমাত্র তাঁদের ভাষার ভিত্তিতে আটক করা হতে থাকে।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে পহেলগাঁও হামলার পর দেশজুড়ে শুরু হওয়া অভিযানে হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয় এবং অনেককে সীমান্ত পার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কিছু ব্যক্তিকে ত্রিপুরা হয়ে সীমান্তে নিয়ে গিয়ে কোনও শুনানির সুযোগ না দিয়েই ‘নো-ম্যানস ল্যান্ড’-এ ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

এই এক দশকের অভিজ্ঞতায় দুটি বৈশিষ্ট্য বারবার ফিরে এসেছে, এবং আলোচনার ক্ষেত্রে সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, এই অভিযানের তীব্রতা ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী লাভের হিসাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। যখনই কোনও ভোট সামনে এসেছে, তখনই ‘অনুপ্রবেশকারী’ প্রসঙ্গটি সবচেয়ে জোরালোভাবে সামনে আনা হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গ, তার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত, উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যা এবং সেই

প্রতীকী গুরুত্বের কারণে, এবং যেখানে সংঘ পরিবার দীর্ঘদিন প্রবেশ করতে পারেনি, বরাবরই ছিল সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, এই সমগ্র ব্যবস্থাটি বারবার এমন ধরনের অন্যায় ও গুরুতর ত্রুটি (!) ঘটিয়েছে, যাতে খুব স্বাভাবিকভাবে এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ার কথা। প্রতিবারই মানুষের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর আদালতের হস্তক্ষেপে সেই ভুলগুলির সংশোধন হয়েছে। কোনও রাষ্ট্র যদি জেনেবুঝে এমন পদ্ধতি চালাতে থাকে যে পদ্ধতিতে নাগরিকদেরও দেশছাড়া করা হচ্ছে, এবং সেই একই পদ্ধতি চালিয়েই যেতে থাকে, তবে সে কার্যত ঘোষণা করে দেয় যে নাগরিকদের বহিষ্কার হওয়াকে সে গ্রহণযোগ্য আদর্শ হিসেবেই বিবেচনা করছে।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ এই কাহিনির সূচনাবিন্দু নয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রলিখিত এই কাহিনির সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী অধ্যায়।

অনুপ্রবেশকারীর আদর্শগত নির্মাণ: ধারণার উৎস ও বিবর্তন

এই সমগ্র প্রক্রিয়ার কোনও অংশই তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি বা পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভাবিত নয়। কারণ ‘অনুপ্রবেশকারী’ চরিত্রটি কোনও নীতিগত উদ্ভাবন নয়; এটি এমন এক আদর্শের কেন্দ্রীয় ধারণা, যাকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রায় এক শতাব্দী ধরে ক্রমাগত পরিশীলিত ও সুসংহত করে তুলেছে।

সংঘের দীর্ঘতম সময়ের সরসংঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর এই ধারণাকে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রূপ দেন। তাঁর ১৯৩৯ সালের গ্রন্থ We, or Our Nationhood Defined-এ তিনি একটি জাতির পাঁচটি মৌলিক ঐক্যের কথা বলেন – ভূগোল, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষা। এই সূত্র ধরে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ভারত একমাত্র হিন্দুদেরই মাতৃভূমি।

হিটলারের উত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে লেখা ওই বইয়ে নাৎসি জার্মানির ইহুদি

জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার নীতিকে ‘জাতিগত গৌরবের সর্বোচ্চ প্রকাশ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, ভারত এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে ও লাভবান হতে পারে। গোলওয়ালকরের যুক্তি ছিল, সংখ্যালঘুদের হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে হবে এবং কোনও পৃথক অধিকারের দাবি ত্যাগ করতে হবে, নয়তো সম্পূর্ণ অধীনস্ত অবস্থায় বাস করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরএসএস বিভিন্ন সময়ে এই দাবি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে যে বইটির প্রকৃত রচয়িতা গোলওয়ালকর ছিলেন না। তাদের বক্তব্য, তিনি হয়তো একটি পুরনো মারাঠি গ্রন্থের রূপান্তর করেছিলেন মাত্র। তাঁর সমর্থকেরা পরবর্তী সময়ে তাঁর অবস্থানের কিছু নমনীয়তার উদাহরণও তুলে ধরেন। তবে এই ভাবধারার ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করা কঠিন। ১৯৬৬ সালের Bunch of Thoughts গ্রন্থে গোলওয়ালকর মুসলমান, খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্টদের জাতির তিনটি ‘অভ্যন্তরীণ বিপদ’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই শ্রেণিবিভাগ – অর্থাৎ আমাদের মধ্যেই বাস করে আমাদের শত্রু, প্রতিবেশীর মুখোশ পরে – হাকিমপুর সীমান্তে আজ যে রাজনীতি কার্যকর হচ্ছে, তার সঙ্গে সরাসরি মিলে যায়।

এই আদর্শগত উত্তরাধিকার থেকেই বর্তমান অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলটি এসেছে: অভিবাসীকে দুটি পৃথক চরিত্রে বিভক্ত করা। একদিকে রয়েছে ‘শরণার্থী’, যে নিপীড়নের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আশ্রয়ের দাবিদার। অন্যদিকে রয়েছে ‘ঘুসপৈঠিয়া’ বা ‘অনুপ্রবেশকারী’ – এমন এক অভ্যন্তরীণ শত্রু, যে গোপনে প্রবেশ করে জাতির শরীরকে দূষিত করতে এসেছে।

২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রথমবার এই বিভাজনকে আইনের মর্যাদা দেয়। প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টানদের জন্য নাগরিকত্বের পথ দ্রুততর করা হয়, অথচ মুসলমানদের স্পষ্টভাবেই সেই সুবিধার বাইরে রাখা হয়। এনআরসি-র সঙ্গে মিলিত হয়ে এই আইন এমন একটি কাঠামো তৈরি করে, যার কেন্দ্রে রয়েছে একটি ধর্মভিত্তিক পরীক্ষা।

আপনাকে আপনার বংশপরিচয় প্রমাণ করতে হবে; আর যদি তা করতে না পারেন, তবে আপনার ধর্মই নির্ধারণ করবে আপনি আলিঙ্গনযোগ্য শরণার্থী, নাকি অপসারণযোগ্য ‘উইপোকা’।

‘উইপোকা’ শব্দটি এখানে কোনও অলঙ্কারিক উদ্ভাবন নয়। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বর্ণনা করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই জনসভা থেকে এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। মানুষকে অবমানব করে তোলা এই রাজনৈতিক ভাষা কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নয়; বরং সেটিই এই আদর্শের চালিকাশক্তি। কারণ প্রতিবেশীদের দেশছাড়া করা যায় না, কীটপতঙ্গকে নির্মূল করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধর্মভিত্তিক যুক্তি কার্যত কোন আবডাল রাখেনি। বিভিন্ন প্রতিবেদনে যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এই উচ্ছেদ ও বহিষ্কার অভিযান মূলত মুসলিম অভিবাসীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে, অন্যদিকে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ আপাতভাবে সিএএ-র কাঠামোর ‘সুরক্ষার’ আওতায় থাকছেন। যে রাজ্যে প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান, সেখানে এমন একটি অভিযান – যা ধর্মের ভিত্তিতে ঠিক করছে কে বহিষ্কারের মুখোমুখি হবে আর কে সুরক্ষিত থাকবে – তাকে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বলা যায় না। এটি সেই হিন্দু ভোটারদের উদ্দেশে পাঠানো একটি ডেমোগ্রাফিক ও রাজনৈতিক বার্তা, যাঁদের সমর্থনেই এই সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

এই অর্থেই ‘পুশব্যাক’ বা সীমান্ত পার করে ফেরত পাঠানোর এই নীতি শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়; একটি আদর্শগত আক্রমণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কমিয়ে আনা নয়, যার স্পষ্ট হিসাব কেউই কোনদিন দিতে পারে নি। উদ্দেশ্য হল জাতির সীমানাকে রাজনৈতিকভাবে মঞ্চস্থ করা। বারবার, প্রকাশ্যে এবং দৃশ্যমানভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে যে কারা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত, আর কারা চিরকাল শর্তসাপেক্ষে ও অনিশ্চিত অবস্থানে থাকবেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] *International Covenant on Civil and Political Rights* [illegible] *Universal Declaration of Human Rights* [illegible] *non-refoulement* [illegible]

বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন, তাঁকে জোর করে সেই স্থানে ফেরত না পাঠানোর বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিতে পরিণত হয়েছে। বহু আইনজ্ঞের মতে, এটি এমন এক বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক নীতি, যেখান থেকে কোনও রাষ্ট্রের সরে আসার সুযোগ নেই।

ভারতীয় আদালতও এই নীতিকে ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। NHRC বনাম State of Arunachal Pradesh (১৯৯৬) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ঠিক এই যুক্তিতেই চাকমা শরণার্থীদের উচ্ছেদ রুখে দেয়। একইভাবে Ktaer Abbas Habib Al Qutaifi বনাম Union of India (১৯৯৯) মামলায় গুজরাত হাইকোর্টও একই অবস্থান গ্রহণ করে। সংবিধানের ৫১(গ) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগত দায়বদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য বিপরীতমুখী প্রবণতাও রয়েছে, এবং সেটিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। Mohammad Salimullah বনাম Union of India (২০২১) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ এবং ভারতের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষর না করার অবস্থানের কথা উল্লেখ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। বর্তমানে সরকার, তার কীর্তিকলাপ এই আদেশকে হাতিয়ার করেই সংঘটিত করছে।

তবু কোনও সরকার যদি শুনানির সুযোগ না দিয়েই মানুষকে সীমান্ত পার করে দেয়, তবে তা আইনের সীমার মধ্যে থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ নয়; বরং তা নিজের সংবিধান লঙ্ঘন করা এবং স্বেচ্ছায় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারগুলিরও অবমাননা। ‘পুশব্যাক’, ‘অনুপ্রবেশবিরোধী অভিযান’, ‘হোল্ডিং সেন্টার’, প্রতিটি শব্দবন্ধ যে প্রক্রিয়াকে আড়াল, তা হল মানুষকে নির্বিচার আটক এবং সমষ্টিগত বহিষ্কার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাষ্ট্রেরই সংজ্ঞায় নাগরিক, কিন্তু কাউকেই কোনও বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি।

এই ব্যবস্থা ভারতীয় আইন বা আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিপন্থী। যে কোনও সভ্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলিরও পরিপন্থী। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেওয়ার আগে তার অভিযোগ প্রমাণ করবে; কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে পরিবার ভেঙে দেওয়া যাবে না। কোনও গর্ভবতী নারী এমন কোনও ‘মালপত্র’ নন, যাঁকে অন্ধকারের মধ্যে সীমান্ত পার করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সরিয়ে দেওয়া যাবে।

‘বাংলাদেশি’ নির্মানের কারিগর কারা? সংবাদমাধ্যম, মমতা এবং শ্রেণির প্রশ্ন

এই আদর্শগত কাঠামো নি:সন্দেহে সংঘ পরিবারের সৃষ্টি, কিন্তু তাতে রসদ যোগানোর কাজ সংঘ একা করেনি।এই কাঠামোয় রঙমাটি যুগিয়ে ‘বাংলাদেশি’কে এক ভয়াবহ উপস্থিতি হিসেবে কল্পনা করার রীতি, বহুতে মিলে নির্মাণ করেছে। এই কল্পিত ‘অবৈধ’ বাংলাদেশী চাকরি কেড়ে নেয়, জনবিন্যাস বদলে দেয় এবং অন্যের নামে ভোট দেয়। কয়েক দশক ধরে কোন প্রমাণিত সরকারী পরিসংখ্যান ছাড়াই বাংলার রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতার বিস্তৃত বাজারে এই ধারণা নির্মিত হয়েছে। বিজেপির প্রধান সাফল্য উদ্বেগ সৃষ্টি করাতে নিহিত নেই, পুর্বেই সৃষ্ট উদ্বেগকে তারা রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেছে।

সংবাদমাধ্যমও এই ইতিহাসের অংশ। ‘বাংলাদেশি’ ধারণাটি বাঙালির কল্পনায় কোনও নিরপেক্ষ তথ্য হিসেবে প্রবেশ করেনি। ন্যারেটিভ হিসেবে পরিকল্পিত নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রধান মুখপত্র হিসেবে পরিচিত, ভদ্রলোক-পোষিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা এবং বৃহত্তর বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যম, সম্মানিত জনমতের পরিসরে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম অভিবাসীকে বিশৃঙ্খলা, ডেমোগ্রাফিক বিপদ এবং অপরাধপ্রবণতার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই উদ্বেগের শিকড় গভীর। দেশভাগের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন, জাতপাত ও শ্রেণিগত মানসিকতায় প্রভাবিত কলকাতার ভদ্রলোক সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই শহরের প্রান্তে বসবাসকারী দরিদ্র, মুসলিম এবং প্রায়শই উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর প্রতি এক ধরনের অস্বস্তি ও সংশয় ও ফোবিয়া পোষণ করে এসেছে। ‘বাংলাদেশি’কে ঘিরে নির্মিত জনধারণা সেই সামাজিক ও ঐতিহাসিক অস্বস্তিরই রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতাগত প্রকাশ।

আর এই জায়গাতে এসে যুক্তিটি বেপথু হয়ে পড়ে, সমগ্র প্রকল্পের প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়ে যায়। যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ‘বাংলাদেশি’ খুঁজে বেড়ায়, সেই যন্ত্রই দিল্লি, গুজরাত বা অসমে বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় শ্রমিকদের, শুধুমাত্র তাঁদের ভাষা বা উপভাষার ভিত্তিতে ‘বাংলাদেশি’ বলে চিহ্নিত করে। ওড়িশা ও গুরুগ্রামে যেসব বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিককে তাঁদের কথ্য ভাষার কারণে আটক করা হয়েছিল, তাঁরা যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন, বিষয়টা এমন নয় মোটেই। ঘটনাই দেখিয়ে দেয় যে ‘বাংলাদেশি’ শ্রেণিবিভাগটি আদতে কী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

এদেশে বাস্তবে ‘বাংলাদেশি’ কোনও জাতীয় পরিচয়ের নিরপেক্ষ বর্ণনা নয়। অবমাননাকর এক অভিধা, যার মধ্যে তিন ধরনের বিদ্বেষ একাকার হয়ে যায় – মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ, বাঙালির প্রতি বিদ্বেষ এবং দরিদ্র মানুষের প্রতি বিদ্বেষ। এই অভিযান পশ্চিমবঙ্গে পরিচালিত হলেও তার মধ্যে একটি বাঙালি-বিরোধী চরিত্র রয়েছে। কারণ হিন্দুত্ববাদী কল্পনায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম শ্রমিকই সন্দেহভাজনের আদর্শ প্রতিমূর্তি। আর বাংলা ভাষা নিজেই সেখানে এক ধরনের ‘দূষণ’-এর চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই কারণেই কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে পা রাখামাত্র বহু বাঙালি অভিবাসী শ্রমিককে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং নজরদারির আওতায় আনা হয়।

আসলে, এটি শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ। লক্ষ্য করে দেখুন, কারা এই অভিযানের শিকার হচ্ছেন: বর্জ্য সংগ্রহকারী, রাজমিস্ত্রি, দিনমজুর,

পথবিক্রেতা, সেই দরিদ্র অভিবাসী শ্রমিকেরা, যাঁরা নিজেদের জেলায় জীবিকা নির্বাহের সুযোগ না থাকায় কাজের খোঁজে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেন। তাঁদের দারিদ্র্যকেই তাঁদের ‘বিদেশি’ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়। তাঁদের শিক্ষা, খাদ্য, জীবিকার নিশ্চিতি দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ। যে নথিপত্র রাষ্ট্রের তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা অথচ তা সে দিতে ব্যর্থ, সেই নথির অনুপস্থিতি তাঁদেরই অপরাধের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

‘বাংলাদেশি’ তাড়ানোর অভিযান সম্পদশালী বা নথিপত্রসমৃদ্ধ মানুষদের বিশেষভাবে অসুবিধায় ফেলে না। এই প্রক্তিয়া শ্রমশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, অনিশ্চিত জীবিকার উপর নির্ভরশীল মানুষদের স্থানচ্যুত করে এবং দেশের সবচেয়ে অসুরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বারবার ব্যবহারযোগ্য একটি রাজনৈতিক সম্পদে পরিণত করে। ‘বাংলাদেশি’ ধারণাটি আসলে সেই ত্র্যহস্পর্শ যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, বাঙালি-বিদ্বেষ এবং শ্রেণিগত তাচ্ছিল্য একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মিলনবিন্দুই অমানবিক এই নীতির আসল বিষয়বস্তু। নথিবিহীন অভিবাসীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ নয়।

বহিষ্কারের বিশ্বজনীন ব্যাকরণ

পশ্চিমবঙ্গের এই কাহিনি শুধুই ভারতের কাহিনি হয়ে থেকে যায় না। কল্পিত ‘অনুপ্রবেশকারী’র ধারণা, প্রমাণের দায় উল্টে অভিযুক্তের উপর চাপিয়ে দেওয়া, গণবহিষ্কারের আমলাতান্ত্রিক নাট্যরূপ, প্রকাশ্য ধরপাকড়ের পরিবর্তে ‘স্বেচ্ছায়’ দেশত্যাগকে উৎসাহিত করা, এ সমস্তই এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাধারণ ব্যাকরণে পরিণত হয়েছে। বহিরাগত-বিদ্বেষের উপর দাঁড়িয়ে আছে এইসব এবং সেই বিদ্বেষের মাধ্যমেই শাসক নিজেকে টিকিয়ে রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে গণ-বহিষ্কার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি নির্বাচনী প্রচারে দিয়েছিলেন। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের শীর্ষ পর্যায়ে,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দেওয়া।

২০২৩ সালে পটসডামে অনুষ্ঠিত একটি গোপন বৈঠক, যা সংবাদমাধ্যম Correctiv প্রকাশ্যে আনে, সেখানে Alternative for Germany (AfD)-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই প্রকাশ্যে আসা তথ্যের প্রতিবাদে ১০ লক্ষেরও বেশি জার্মান নাগরিক রাস্তায় নেমেছিলেন। কিন্তু তাতেও ধারণাটির অগ্রযাত্রা থামেনি।

বরং AfD-র নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই ‘রিমাইগ্রেশন’ শব্দটিকে গ্রহণ করে। বর্তমানে এটি অস্ট্রিয়ার এফপিও (FPÖ), স্পেনের ভক্স (Vox), ইতালির লেগা (Lega), ফ্রান্সের রেকঁকেত (Reconquête) এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণপন্থী দলের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি প্রতিবছর ‘রিমাইগ্রেশন সামিট’-ও অনুষ্ঠিত হয়; এ বছর যার আয়োজন হয়েছিল ৩০ মে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হল, ইউরোপে এখন কট্টর দক্ষিণপন্থী কর্মসূচি এগিয়ে নিতে তাদের ক্ষমতায় থাকারও প্রয়োজন হচ্ছে না। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট একটি বিস্তৃত নতুন প্রত্যাবর্তন (return) ব্যবস্থা অনুমোদন করে। এই ব্যবস্থায় আটক রাখার পরিসর বৃদ্ধি, বাড়িতে তল্লাশি চালানোর ক্ষমতা এবং কর্মক্ষেত্র, স্কুল ও হাসপাতালগুলিতে নথিবিহীন মানুষদের ‘চিহ্নিত’ করার বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় মধ্য-দক্ষিণপন্থী দলগুলির সঙ্গে AfD-র সহযোগিতার ভিত্তিতে, যা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ‘কর্ডন স্যানিতেয়ার’ বা বিচ্ছিন্নকরণ নীতিকে কার্যত ভেঙে দেয়।

২০২৬ সালের ১২ জুন ইউরোপীয় ইউনিয়নের Pact on Migration and Asylum কার্যকর হয়েছে। ব্রাসেলস এখন তৃতীয় দেশগুলিতে ‘রিটার্ন হাব’ গড়ে তুলছে, যার মডেল ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি আলবেনিয়ায় স্থাপিত আটক কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে চালু করেছিলেন। অন্যদিকে, সীমান্তরক্ষী সংস্থা

ফ্রন্টেক্স (Frontex) – যার বিরুদ্ধে বারবার বেআইনি ‘পুশব্যাক’-এর অভিযোগ উঠেছে – তার বাজেটও ক্রমশ বেড়ে প্রায় ১২০০ কোটি ইউরো ছুঁইছুঁই।

একজন ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকের ভাষায়, মহাদেশটি নীরবে নিজের একটি ‘আইসিই’ গড়ে তুলছে। কট্টর দক্ষিণপন্থীরা ভোটবাক্সে জিততে পারেনি, কিন্তু আইন ও নীতির ভাষার মধ্য দিয়ে নিজেদের জিৎ অর্জন করছে।

সাধারণ চালিকাশক্তি

এই ঘটনাগুলিকে পাশাপাশি রেখে দেখলে তাদের অভিন্ন কাঠামোটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি স্থায়ী অভ্যন্তরীণ শত্রু নির্মাণ করা হয় – ‘অনুপ্রবেশকারী’, ‘অবৈধ অভিবাসী’ বা ‘এখনও স্বদেশে ফিরে না যাওয়া ব্যক্তি’। এই পরিচয়গুলি কোনও ব্যক্তি কী করেছেন, তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। তিনি কে, তার ভিত্তিতেই তাঁকে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রমাণের দায় উল্টে দেওয়া হয়। ফলে একজন মানুষের অন্তর্ভুক্তি বা নাগরিক পরিচয়কে বারবার প্রমাণ করতে হয়, এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা যে কোনও সময় প্রশ্নের মুখে ফেলা বা প্রত্যাহার করা সম্ভব।

প্রতিটি ব্যবস্থাই হিংস্রতার দায় সরাসরি নিজের কাঁধে না নিয়ে তা আমলাতন্ত্রের উপর এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের নিজেদের উপর চাপিয়ে দেয়। তাই প্রকাশ্য ধরপাকড় বা অভিযানের বদলে ‘স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ’-এর অ্যাপ কিংবা আগাম আতঙ্কে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে বেশি পছন্দ করা হয় – কারণ এগুলি কম ব্যয়বহুল, কম দৃশ্যমান এবং জনসমক্ষে উপস্থাপন করাও তুলনামূলকভাবে সহজ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই প্রতিটি প্রকল্প বিদেশি-বিদ্বেষকে কোনও

আকস্মিক অতিরঞ্জন হিসেবে ব্যবহার করে না; বরং সেটিকেই পুনর্নবীকরণযোগ্য রাজনৈতিক জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগায়। রাজনীতিটাই এমন, যা নিজের সমর্থকদের ক্রমাগত সংগঠিত ও সক্রিয় রাখতে চাইলে, বারবার নতুন ‘বহিরাগত’ তৈরি করতে বাধ্য।

ভারতের ক্ষেত্রে পার্থক্যটি হল তার অকপটতা। ইউরোপ ‘প্রত্যাবর্তন’ বা return-এর নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ভাষার আড়ালে ধর্মীয় যুক্তিকে ঢেকে রাখে, আর যুক্তরাষ্ট্র তা করে অপরাধ দমনের ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু সিএএ-এনআরসি কাঠামো ধর্মভিত্তিক পরীক্ষাটিকেই সরাসরি আইনের মধ্যে লিখে দিয়েছে, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে কোন ধর্মাবলম্বীদের স্বাগত জানানো হবে এবং কোন ধর্মাবলম্বীদের নয়।

এই অর্থে আরএসএস-বিজেপির প্রকল্প পশ্চিমা বিশ্বের এই প্রবণতার কোনও বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী সংস্করণ নয়; বরং তার সবচেয়ে অকপট রূপ। এখানে সেই নীরব অনুমানটি, যা প্রায় সব বহিষ্কার-ভিত্তিক ব্যবস্থার ভিতরে কাজ করে, যে কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশি ‘স্বদেশীয়’, বেশি ‘আসল’ অধিবাসী, সেটিই শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়।

হাকিমপুর সীমান্তে অপেক্ষমাণ পরিবারগুলি এই সত্যটি কোনও বিশ্লেষকের ভাষায় ব্যাখ্যা করার অনেক আগেই নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে গিয়েছিল। তারা চলে গিয়েছিল, কারণ তারা শিখে ফেলেছিল যে এই ব্যবস্থায় নথিপত্র কোনও নিশ্চয়তা নয়, আদালতের হস্তক্ষেপ প্রায়শই অনেক দেরিতে আসে, আর রাষ্ট্র যদি একবার স্থির করে ফেলে যে তার এখানে থাকার অধিকার নেই, তাহলে তার হিংস্র পদক্ষেপের আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ পথ।

বর্তমানে একই ন্যারেটিভ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও উচ্চারণে একসঙ্গে তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ‘পুশব্যাক’-এর ঘটনাগুলি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশকে ঘিরে কোনও প্রশ্নই উত্থাপন করে না। আড়াল হলেও প্রশ্ন থেকেই যায়। নাগরিকত্বের অধিকার একজন কি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ? নাকি তাকে পরিণত করা হবে নির্দিষ্ট মর্যাদায় যার জন্য মানুষকে অনন্তকাল ধরে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করে যেতে হবে এমন এক পৃথিবীতে যেখানে ধর্ম, ভাষা ও দারিদ্র্য তাঁকে নি:সাড়ে, নীরবে অযোগ্য ঘোষণা করে দিতে পারে।

About the Author



Sushovan Dhar
Author

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint

View All Posts



Sushovan Dhar

+ posts
Editorial Board Member of Alternative Viewpoint